দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোরও।

এই যে এত কিছু ঘটে, নজরদারির কেউ নেই?

আছে বইকি। একটা সংগঠনই তো রয়েছে কিম্বারলি প্রোসেস নামে। ২০০৩ সাল থেকে এই সংগঠনটি কাজ করে আসছে আন্তর্জাতিক স্তরে। উদ্দেশ্য, সমস্ত নিয়মকানুন মেনে হিরে খনি থেকে তোলা হচ্ছে কি না, অথবা তা সৎপথে বাজার অবধি পৌঁছাচ্ছে কিনা, তা দেখা। তবে এখানেও কিছু 'কিন্তু' আছে। প্রথম কথা তো, এই কিম্বারলি সার্টিফিকেটের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠছে। মাঝেমাধ্যেই ধরা পড়ছে জাল কিম্বারলি সার্টিফিকেটও। তা ছাড়া এই সার্টিফিকেট কেবল এটুকুই নিশ্চিত করতে পারে যে ওই হিরে কোনও যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীর হাতে পড়ে অস্ত্র কেনাবেচার কাজে লাগছে কি না। কিন্তু যদি কোনও দেশের সরকারই সে দেশের হিরে খনির শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, যদি খোদ সরকারই সেই অত্যাচারের কাহিনি যাতে বাইরে না বেরোয় সে জন্য চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেয় ট্যাঁ ফো করতে চাওয়া শ্রমিকদের, তা হলে আর কিছুই করার থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কিম্বারলি সার্টিফিকেটটি অবশ্যই জুড়ে দেবে। এত সব নিয়ম কানুন কিন্তু আসলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতো। কারণ কোনও হিরের সঙ্গে আসলে যন্ত্রণা এবং অত্যাচারের কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা ঠিকমতো খতিয়ে দেখতে পারে না (অথবা দেখে না) কিম্বারলি প্রোসেস। খুব সহজেই এই গোটা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে তাদের হিরে বাজারজাত করে ফেলে চোরাকারবারিরা। এমনকি, সমালোচকেরা তো এটাও বলেন যে শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যে সব খনি থেকে হিরে তুলে আনা হয়, সেই সব হিরেকেও অবলীলায় 'সার্টিফিকেট' দিয়ে দেয় কিম্বারলি।

আসলে কিম্বারলি নির্ধারিত সংজ্ঞা দ্বারা যে হিরে কোনও গেরিলা শক্তির কোষাগার বৃদ্ধিতে মদত দেয় না, সেটাই 'সাফসুতরো' হিরে। অর্থাৎ, যে হিরে কিম্বারলি সার্টিফিকেট পেয়েছে সেই হিরে হয়তো কোনও জঙ্গি সংগঠনের হাতে অর্থ পৌঁছে দিচ্ছে না, কিন্তু এমনটা হতেই পারে যে খনি থেকে সেই হিরে তুলে আনতে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে খনিশ্রমিকদের। হতেই পারে সেই হিরে তুলে এনেছে কোনও শিশু শ্রমিক। হতেই পারে সেই হিরে তুলে আনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোনও তরুণী বা নাবালিকাকে ধর্ষণের ইতিহাস। অথবা হতেই পারে ওই হিরে তুলে আনার মজুরি হিসাবে শ্রমিকেরা যা পেয়েছেন তাতে আসলে আধখানা রুটিও হয় না। হতে পারে। হতেই পারে। কিন্তু সে সব না বুঝে অথবা বুঝেও না বুঝে মুখে কুলুপ এঁটে রয়ে যাবে কিম্বারলি।

কিম্বারলি নিয়ে ক্ষোভ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটা একটা উদাহরণ দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। ২০০৩ সালে ওই কিম্বারলি প্রসেসের জন্মলগ্নে তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল গ্লোবাল উইটনেস নামের একটি সংগঠন। সেই গ্লোবাল উইটনেসই তো ২০১১ সালে কিম্বারলি প্রসেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। কড়া ভাষায় ওই সংগঠনটি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'কিম্বারলি প্রসেস হল হিরে পাচারের ক্ষেত্রে এক অন্যতম সহায়'।

তা ব্লাড ডায়মন্ড নাকি ব্লাড ডায়মন্ড নয়, হিরের এই জাতবিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত যে সংগঠনের উপরে, তারই যখন এই ভাবমূর্তি, তখন গোটা প্রক্রিয়াটি যে কতখানি সুষ্ঠু, তা তো স্পষ্টই হয়ে যায়।

কেবল রিপাবলিক অফ কঙ্গোয় যে সব হিরের বেচাকেনা হয় কিম্বারলি প্রসেসের সার্টিফিকেটি–সহ, সেগুলো আদৌ সে দেশেরই খনি থেকে তোলা, নাকি অন্য কোনও দেশের নাকি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে, সে কথাও নিশ্চিত করে বলতে পারবে না সে দেশের সরকারই। তা হলে বিশ্বজোড়া হিরের চোরাকারবার রোখা যাবে কীভাবে?

যায় না। যাবেও না। বিশেষ করে হিরের চোরাকারবারের পথটা এতটাই প্যাঁচালো এবং অন্ধকারে ঢাকা যে সেই পথে দরজা বসিয়ে তাতে তালা ঝোলানো একপ্রকার অসম্ভবই। এমনিতেই তো হিরের মতো আকারে ছোট অথচ অত্যন্ত দামি বস্তু পাচার করার সুবিধা অনেক। সীমান্ত এলাকা দিয়ে অন্য যে কোনও বস্তু পাচার করার থেকে বেশি সুবিধা হল, হিরে পাচার করতে। তা ছাড়া হিরে তো এখন চোরাকারবারিদের জগতের মোটামুটি সর্বজনমান্য কারেন্সি। বড় বড় জঙ্গি সংগঠন, যেমন আল কায়দা, তারাও তো হিরে দিয়েই সারে যত অন্ধকারে মোড়া কেনাবেচা। আর এ সবের সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো যুক্ত হয়েছে সরকারি স্মাগলিং। শুনতে আবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আফ্রিকার বেশ কিছু দেশের সরকারই সরাসরি যুক্ত হিরে স্মাগলিংয়ের সঙ্গে। জিম্বাবোয়েতে রবার্ট মুগাবের শাসনকালে সরকারিভাবেই চালানো হতো হিরের চোরাকারবারের বিশাল নেটওয়ার্ক। সে দেশের কোষাগার থেকে কোটি কোটি হিরে বেচা টাকা সরিয়ে ফেলেছিল মুগাবেরাই।

আসলে হিরের ব্যবসা যত পুরোনো, এই ব্লাড ডায়মন্ডের কাহিনিও ততটাই পুরোনো। খনি থেকে হিরে তুলে বিক্রি করার ইতিহাস তো আসলে হিংসা, নিষ্ঠুরতা, চোরাকারবার, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধনের ইতিহাস। দশকের পর দশক ধরে এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই চলেছে। পণ্ডিতরা বলেন, হিরের কদর বহুদিন ধরেই ছিল ঠিকই তবে তা আসলে জনসাধারণের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই পায় চল্লিশের দশক থেকে। কারণ সেই সময় থেকেই এনগেজমেন্ট রিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায় হিরের নাম। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে আপনি কতটা ভালোবাসেন তার একটা একক হয়ে দাঁড়ায় হিরে। রমরমা ব্যবসার গন্ধ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বড় বড় সংস্থা। খনি থেকে হিরে তুলে নিয়ে আসাই হোক অথবা একা একা নদীর জল ছেঁকে কিংবা মাটি খুঁড়ে হিরে খোঁজাই হোক, উন্মাদনাটা বাড়তে থাকে ওই চল্লিশের দশক থেকেই। এদিকে নব্বইয়ের দশক থেকে আফ্রিকার হিরে উৎপাদনকারী দেশগুলো গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে পড়ে। সিয়েরা লিওন হোক অথবা অ্যাঙ্গোলা–সব দেশের গৃহযুদ্ধের তখন একটাই সারকথা, যুদ্ধের রসদ জোগাচ্ছে হিরে। থ্রুড়ি, ব্লাড ডায়মন্ড। জঙ্গি সংগঠনগুলো অথবা বিদ্রোহী শক্তিগুলো খনি থেকে হিরে তুলে বেচে দিচ্ছে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর হাতে। আর তারা দিব্যি কিনেও নিচ্ছে তা। ক্রমশ এই কথা প্রকাশ্যে আসে। ক্রেতারাও সচেতন হতে থাকেন। যদি হিরের গায়ে লেগে থাকে অদৃশ্য রক্ত তা হলেও কি আপনি সেটা কিনতে চাইবেন? এই প্রশ্ন ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তখনই একপ্রকার বাধ্য হয়ে, ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে কিম্বারলি প্রসেস নামের ওই সংগঠনের জন্ম হয়। কিন্তু তাতে কতটা কাজের কাজ হয়েছে, সেটা এমন একটা প্রশ্ন যার কোনও উত্তর নেই।

এ তো গেল সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের কথা। ভারতেও তো হিরের খনি রয়েছে। হিরে তোলা হয় সে সব দেশি খনি থেকেও। হ্যাঁ, 'কৃষ্ণ' মহাদেশের সেই সব হীরককাহিনির মতো এ দেশের গল্পগুলি হয়তো তেমন রক্তমাখা নয়, তবে কিছু উত্তেজক কাহিনি এখানেও অবশ্যই রয়েছে।

স্রেফ কোহিনুরের কথাই ধরা যাক না কেন। আমরা তো মনে করি যে কোহিনুরকে ভারত থেকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশেরা। আর সেই ঘটনায় সবসময়েই ভিলেন হিসাবে উঠে আসে লর্ড ডালহৌসির নাম। এদিকে উইলিয়াম ডালরিম্পল এবং অনীতা আনন্দ তাঁদের 'কোহিনুর ঃ দ্য স্টোরি অফ ওয়ার্লডস মোস্ট ইনফেমাস ডায়মন্ড' বইটিতে জানিয়েছেন,ব্রিটিশদেরও ঢের আগে ভারত থেকে লুঠ হয়ে গিয়েছিল কোহিনুর। সে সব পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণের আমলের কথা। যুদ্ধ, লুঠ, রক্ত পেরিয়ে ফের উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ দেশে ফিরে আসে কোহিনুর। আসে পঞ্জাবে। তখন থেকেই ফের হইচই শুরু হয় এই হিরেটিকে নিয়ে।

আর এই যে হালের নীরব মোদির কোটি কোটি টাকা আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ! সেখানেও তো পরোক্ষভাবে জড়িয়ে হীরক–কথার উপাখ্যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ঘনিষ্ঠজন' শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির বড় ছেলে আকাশের বিয়ে হতে চলেছে হীরক ব্যবসায়ী রাসেল ও মোনা মেহতার মেয়ে শ্লোকের। মোনার ভ্রাতৃজায়া হলেন নীরবের বোন পূর্বী। যা নিয়ে দেশ এখন তোলপাড় তা হল, বিভিন্ন ব্যাংকের তরফে দায়ের করা দুর্নীতি মামলা ও পানামা পেপারে রয়েছে রাসেলের কোম্পানি 'রোজি ব্লু ডায়মন্ড'–এর নাম। আর তাই এই হিরে ব্যবসায়ী পরিবারের সঙ্গে আম্বানিদের এই হীরকখচিত বন্ধন নিয়ে গুজবের পারদ উর্ধমুখী।

ভাগ্য ভালো, বিজয়বাবুর স্ত্রী কাগজটাগজ তেমন পড়েন না। টিভিতে পছন্দের সিরিয়াল ছাড়া আর কিছু দেখেন না। তাই ভেলভেটের বাক্সসমেত হিরের পেন্ডেন্টটা তিনি সযত্নে তুলে রেখেছেন লকারে। ওই হিরের গায়েও কি রক্ত লেগে? কে জানে!

কোহিনুর, গৌরবের যে রত্ন আজ হাতছাড়া

এমনিতেই তো হিরের মতো আকারে ছোট অথচ অত্যন্ত দামি বস্তু পাচার করার সুবিধা অনেক। সীমান্ত এলাকা দিয়ে অন্য যে কোনও বস্তু পাচার করার থেকে বেশি সুবিধা হল, হিরে পাচার করতে। তা ছাড়া হিরে তো এখন চোরাকারবারিদের জগতের মোটামুটি সর্বজনমান্য কারেন্সি

কিছুই না বুঝতে পারা কিম্বারলি সার্টিফিকেট পদ্ধতি আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ। সরকারি শোষণ নিপীড়নের যন্ত্রণা মাখা সেই সব হিরের বাক্স দিব্যি সার্টিফিকেট পেয়ে জাহাজ অথবা উড়োজাহাজে চেপে রওনা দেয় বাজারের উদ্দেশে।

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবার সময়েই সরকারিবাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কাজের গণ্ডি। কী ছিল সেই নথিতে? কিম্বারলি প্রসেস মনে করে যে 'রাফ ডায়মন্ড' হল সেইসব হিরে যেগুলো আসলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ব্যবহার করে কোনও দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে অস্ত্র কেনাবেচার কাজে। এই সংগঠনের মূল সদস্য হল ৮০টি দেশ। সেই দেশগুলির অধিকাংশই হিরের বাজারের বেশিরভাগটা দখলে রেখেছে। আর ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন আইনজীবী সংস্থা এবং হিরে ব্যবসায়ী সংস্থাও।

এই সংগঠনের সদস্য হতে গেলে বেশ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। প্রথমত, ব্লাড ডায়মন্ড, যার আর একটা নাম হল কনফ্লিক্ট ডায়মন্ড, সে সবের ব্যবসা করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, এই সংগঠনের সদস্য দেশগুলো কেবল নিজেদের মধ্যেই হিরের বেচাকেনা করতে পারবে। তৃতীয়ত, খনি থেকে তুলে আনা হিরের আকর অথবা না কাটা পালিশ না করা হিরের ব্যবসার সময়েও তারা